আর্টফাইন, ভল্যুম-০৭, পৃ. ১ - ২৫, ISSN: 2706-6193

লোকায়ত শিল্পের অনুপ্রেরণার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলায় স্থানিকতার উৎস অনুসন্ধান

এম. এম.ময়েজউদ্দীন*

[**সার-সংক্ষেপ :** দেশজতা বা স্থানিকতা নিয়েই কোনো একটি অঞ্চলের শিল্পকলার ভিত্তি গঠিত হয়। নির্দিষ্ট অঞ্চলের জনমানুষের শিল্পচৈতন্য ওই অঞ্চলের বিশিষ্ট সংস্কৃতিতে ধরা দেয়। একে লোকসংস্কৃতি বলা যেতে পারে। কোনো দেশের চিত্রকলার ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতির ভূমিকা থাকে ব্যাপক। লোক-ঐতিহ্যকে নির্ভর করেই আধুনিক বিশ্বের সব দেশের জাতীয় চিত্রকলার বিকাশ সাধিত হয়েছে। জাতীয় সংস্কৃতি যদি মানুষকে সংলগ্ন করে নির্মিত না হয়, তাহলে তা আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। বাংলাদেশের বিশিষ্ট চিত্রকলার ধারাটি, যা আমাদের দেশের আবহমান জনজাতির রুচির কাঠামোকে ক্রমশ উন্নততর শিল্পসৃষ্টি ও বিকাশের ধারায় আত্তীকৃত করেছে, এর স্বরূপ নির্ধারণের জন্য আমাদের ফিরে তাকাতে হয় সুদূর অতীতের দিকে। ভারতবর্ষে বাংলাদেশের চিত্রকলার রয়েছে সুনির্দিষ্ট পরিচয়; এই পরিচয় গড়ে উঠেছে এদেশের লোকজ চিত্রকর্ম ও এর সাথে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সংশ্লেষণের মাধ্যমে। এই বিশিষ্ট বাঙালি জাতীয়তাবাদ মূলত বাঙালি মুসলমানের স্বদেশচেতনাকে এবং সেই সাথে আধুনিক রাষ্ট্রকাঠামোর উপযোগী চিন্তাধারাকে আত্তীকৃত করে রূপলাভ করেছে। এই নিবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে লোক-ঐতিহ্য কীভাবে বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলাকে প্রভাবিত করেছে।]

ভূমিকা

এদেশের হাজার বছরের শিল্প-সংস্কৃতির ধারাবাহিকতাতেই বিকাশ লাভ করেছে এদেশের আধুনিক চিত্রকলা। সেখানে ইউরোপীয় চিত্রকলার আদর্শ বা করণকৌশল এক্ষেত্রে অনুপস্থিত ছিল না; তবে মূলগতভাবে লোকজ চিত্রকলার তথা লোকায়ত সংস্কৃতির মূলসত্তাটিকে ভিত্তিমূল ধরেই আধুনিকতার পথে তা যাত্রা করেছিল। এই সংযোজন-বিয়োজনের শুরু হয়েছিল অখণ্ড বাংলার কলকাতাকেন্দ্রিক প্রাতিষ্ঠানিক পরিসর থেকেই। সেই সময়টি ছিল ঔপনিবেশিক কালের উপরিতলসর্বস্ব বাস্তবানুগ

---

* **এম. এম. ময়েজউদ্দীন :** সহযোগী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, **ই-মেইল :** maizuddin@juniv.edu

ইংরেজ আদর্শের ছাঁচে চিত্রকলার বিকাশের সময়। তখনকার সময়ে সংকীর্ণভাবে ইংরেজ চিত্রকরদের চিত্রাদর্শই ছিল আমাদের দেশের চিত্রকরদের পাশ্চাত্য চিত্রকলা-সম্পর্কিত ধারণা। আরো পরে, বলা যায় প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই এদেশের শিল্পীগণ জানতে পারেন ফরাসি, জার্মান, ইতালীয় ও অপরাপর ইউরোপীয় চিত্রকলার গতিপ্রকৃতি। এছাড়া আধুনিক জাতীয়তাবাদী স্বদেশি আন্দোলনের প্রেক্ষিতেও তখন শিল্পীগণ ভারতবর্ষের দিকে মুখ ফেরাতে শুরু করেছিলেন। তাঁদের সামনে ছিল অজন্তা, মুঘল, এমনকি চৈনিক চিত্রাদর্শও। সেখান থেকে নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার ধারা বিকশিত হতে থাকে যার শুরু করেছিলেন এদেশের অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর পাশ্চাত্যেরই একজন শিল্প-প্রশিক্ষক ই বি হ্যাভেল। তাঁরা ইংরেজ সভ্যতার আদর্শের নিরিখে নির্দেশিত যান্ত্রিক ছবি পুনরোৎপাদনের বিরোধিতা করেছিলেন। তীব্রভাবে ভারতীয় পৌরাণিক চরিত্রগুলোকে বাস্তববাদী ইউরোপীয় ধারায় অঙ্কিত রবি বর্মার ছবিগুলোকে খারিজ করতে চেয়েছিলেন সাহিত্য, পুরাণগন্ধী প্রাচ্যাদর্শের চিত্রায়ণের মাধ্যমে বিকল্পের অনুসন্ধান করে। তাঁরা জাপানি ওয়াশ টেকনিকেরও ব্যাপক আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁরা ধর্তব্য করেছিলেন গুপ্ত, মৌর্য, মুঘল, পারস্য রীতিতে ভারতের চিত্রকলাকে উন্নীত করার। বলা যায়, সেটিই ছিল আধুনিক ভারতের প্রথম চিত্রকলার সর্বভারতীয় আন্দোলন। যার প্রভাবে আব্দুর রহমান চুঘতাই প্রমুখ মুঘল ঘরানার চিত্রকলার বিকাশ ঘটিয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা বলতে যা বোঝায় তার সাথে এই সব তৎপরতার যোগসূত্র ছিল অল্প; প্রথম প্রজন্মের বাংলাদেশের শিল্পীগণ মূলত লোকজ ঐতিহ্যানুসারী চিত্রকলাকেই নিরীক্ষা ও চর্চার মাধ্যমে বিকশিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রথম প্রজন্মের শিল্পীগণ শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন ইউরোপীয় বাস্তববাদী ধারায়। তাঁরা প্রাচ্যকলার দ্বারাও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করেছিলেন লোকায়ত আদর্শকে। তাঁদের সর্বভারতীয় প্রাচ্যকলার কোনো আবেদন শক্তিশালীভাবে প্রেরণা দান করতে পারেনি। পুরাণনির্ভর ও কাব্যিক বা দরবারি মুঘল চিত্রাদর্শ তাঁদের আগ্রহের বিষয় ছিল না। তাঁদের প্রেরণা তাঁরা লাভ করেছিলেন এদেশের বাঙালি জাতিসত্তার আবহমান কাঁথা, সরা, পাটি, পট, শিকা, বুনন, মৃৎশিল্প, আলপনা, টেরাকোটা, মূর্তি, ভাস্কর্য ইত্যাদি থেকে। পরবর্তী সময়ে তার সাথে সংযুক্ত হয়েছে এদেশের মুক্তি ও গণতান্ত্রিক স্বদেশচেতনার আন্দোলনের ও সংগ্রামের ধারা। ফলে পিকাসো, রেমব্রান্ট, মাইকেলেঞ্জেলো, সার্জেন্ট, মার্ক শাগালের চিত্রবিবেচনার সাথে মিশে গেছে কালিঘাটের পট, গাজির পট, নকশিকাঁথা, ঐতিহ্যবাহী বুননশিল্প, ব্রতের আলপনা এবং এসবের অন্তর্গত নানা লোকজ মোটিফ। ইম্প্রেশনিজম, পরাবাস্তবতার আবহে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে বাংলার প্রকৃতি, নিসর্গ, শাড়ির নকশা, নৌকার গলুইয়ের চোখ উপস্থাপিত হয়ে।

লোকচিত্রের উৎস ও স্বরূপ-সন্ধান

লোককলার উন্মেষের সাথে উপযোগবাদের যোগাযোগ রয়েছে। তবে প্রাচীনকালেও শৌখিন কলাকার্যের উপস্থিতি ছিল না, একথা বলা চলে না। মানুষের বিকাশের একটা পর্যায়ে এসে নন্দনতাত্ত্বিক চেতনারও বিকাশ ঘটেছিল। প্রিমিটিভ আর্ট ও ক্র্যাফট নিয়ে আলোচনার সূত্রে দেখা যাচ্ছে, প্রাচীনকাল থেকেই প্রয়োজনীয়তা থেকে সকল প্রকারের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সূচনা ও বিকাশ ঘটেছে। লোককলার, লোকচিত্রের বিষয়গুলোর স্রষ্টা যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে যৌথতার মাধ্যমে চর্চিত না হয়ে ব্যক্তির দ্বারাই সূচিত হয়, কিন্তু সেক্ষেত্রেও ব্যক্তিশিল্পীর মনন বা চিন্তাচেতনা লোককলায় বিশেষ প্রতিভাত হয় না। উল্লেখ করা যেতে পারে গ্রাম্য ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, নকশিকাঁথা, শিকা বা পটচিত্রের কথা। যৌথ মানস দ্বারাই এসব কলার নন্দনতাত্ত্বিক আদর্শ জারিত হয়েছে। পেশাজীবী কারিগর সম্প্রদায় ভোক্তাশ্রেণির কাছে তাদের উৎপাদিত পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা ও আকর্ষণীয়তা বাড়াতে তাদের শিল্পসামগ্রীকে দৃষ্টিনন্দন করে উপস্থাপন করেছে (ওয়াকিল আহমেদ ২০১৭ : ১১)।

লোকশিল্প সহজ, সজীব ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে থাকে রং-রেখা ও শৈলীর ব্যবহারের দিক থেকে। আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জীবনের কোনো মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা এক্ষেত্রে অনুপস্থিত। দর্শনমাত্র স্থানিকতার বৈশিষ্ট্য এতে দেখা যায়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতাও লোকশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য (ওয়াকিল আহমেদ ২০১৭ : ১২)।

উপাদান-উপকরণ, কলাকৌশল ও আধার-আধেয়ের বিচারে লোকশিল্পের নানা প্রকারভেদ স্বীকৃত; চিত্রকর্ম, নকশা, বুনন, এমব্রয়ডারি, এনগ্রেভিং ইত্যাদি। উপযোগিতার ভিত্তিতে যা-ই নির্মিত হোক না কেন, সবকিছুই শিল্পকর্মরূপে পরিচিতি লাভ করে না; শিল্পকর্ম হতে হলে কিছু শর্তপূরণের বাধ্যবাধকতা থাকে। ভারসাম্য বা আকৃতিগত সমতা, বহির্ভাগের দৃশ্যগত প্রবহমানতা, রেখার তরঙ্গায়িত দোলা, অঙ্গরূপের বৈপরীত্য ইত্যাদি (সৈয়দ আলী আহসান ২০০৪ : ২০২)।

লোককলাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। চারুকলা ও কারুকলা। Encyclopaedia Britannica-তে বলা হয়েছে—

> It has been argued that, where an artist creates, a craftsman merely fabricates; that, whereas the first is a nonmaterialist who makes something for the sake of expression or of disinterested contemplation, the second is a materialist who makes something for a definite function; and that, whereas the first cannot know what is going to produce, the second has an extremely precise foreknowledge accompanied by a plan and a method of execution (Encyclopedia Britannica 2010: 312, 313).

আবার কিছু লোককলা চারু ও কারুশিল্পের যুগপৎ সম্মিলন। শখের হাঁড়ি, অলংকৃত কলস ও ঘট, নকশাদার শীতলপাটি ইত্যাদি। বানানোর পরে অলংকরণ বা চিত্রায়ণেরও

দরকার পড়ে সেক্ষেত্রে। অনেকে আবার এই ভেদরেখা স্বীকার করেন না। কারুশিল্পকেই চারুকলার জননী বলে অভিহিত করে থাকেন। তবে কেউ কেউ কায়িক ও মানসিক শ্রমের মাত্রার দিক থেকেও ভিন্নতার ধারণা দেন। যা হোক, উপাদান-উপকরণের ভিত্তিতে বাংলাদেশের লোককলার কিছু শাখা-প্রশাখা হতে পারে এ রকম :

১. মৃৎশিল্প—যার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তৈজসপত্র, মূর্তি, খেলনা ও পুতুল ইত্যাদি শৌখিন বিষয়, ২. বাঁশ-বেত-শন-পাতা নির্মিত তৈজসপত্র, নকশিপাখা, নকশিপাটি ইত্যাদি, ৩. দারুশিল্প হিসেবে আসবাবপত্র, ভাস্কর্য, খেলনা, ৪. ধাতব লোহা-কাঁসা-তামা-পিতল নির্মিত যন্ত্রপাতি, সোনা-রুপার অলংকার ইত্যাদি, ৫. সূচিশিল্প—যার মধ্যে যাবতীয় নকশিকাঁথা, হাতপাখা থাকবে, ৬. পাট ও রেশম শিল্প—নকশিশিকা, শতরঞ্জি ইত্যাদি, ৭. শঙ্খশিল্প—শাঁখা, বলয়, আংটি, দুল প্রভৃতি, ৮. শোলাশিল্পের মধ্যে থাকবে টোপর ও এজাতীয় শোলার তৈরি বিষয়গুলো, ৯. ঝিনুকশিল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে বিবিধ শৌখিন দ্রব্য এবং ১০. কড়িশিল্প (Encyclopaedia Britannica 2010: 15)।

টুলস ও টেকনিকের ব্যবহারের মধ্যমে উপকরণকে শিল্পী শিল্পে পরিণত করেন। চিত্রশিল্পীর উপকরণ হলো ক্যানভাস; এটাই তাঁর পট বা চিত্র-আধার হিসেবে বিবেচ্য। এর সাথে যুক্ত হয় রংতুলি, কলম-পেনসিল। শিল্পীর সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার মধ্যে আছে কলাকৌশল। রং, রেখা, প্রকার, প্রকৃতি, টোন, আলোছায়া, টেক্সচার ইত্যাদি কীভাবে তিনি ব্যবহার করেন, তার ওপর এই কলাকৌশল নির্ভর করে (নির্মাল্য নাগ ২০০০ : ৯৮)।

লোককলায় মোটিফের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাচ্যধারার চিত্রচর্চায় আমরা যাঁদের পাই, তাঁদের সকলেই লোকশিল্পের কিছু মোটিফকে তাঁদের চিত্রপটে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। মোটিফ হলো গল্পের সেই ক্ষুদ্রতম উপাদান, যা কোনো নির্দিষ্ট সংস্কৃতিতে শক্তিশালীভাবে অস্তিত্বশীল থাকে। এর এই ক্ষমতা থাকতে হলে একে হতে হয় কোনো না কোনো কারণে অসামান্য ও বিখ্যাত। মোটিফ স্বাধীনভাবে টিকে থাকার ক্ষমতা ধারণ করে। এটা হলো কোনো সংস্কৃতিতে রীতিমাফিক বিদ্যমান বস্তুগত উপাদান। মোটিফগুলো জাতীয় জীবনের সাথে অচ্ছেদ্যভাবে বিদ্যমান থাকে। কোনো চিত্রকর্মে একাধিকবারও এর ব্যবহার স্বাভাবিক। লোকশিল্পের মোটিফ হলো শিল্পকর্মের কোনো একক ও স্থায়ী ফর্ম বা ডিজাইন, আধারভেদে এর ফর্ম থাকে অপরিবর্তিত। বাংলাদেশে পদ্ম, কল্কা, সূর্য, জীবনবৃক্ষ, পুষ্পিত লতা, মুখোমুখি জোড়া পাখি, গাছে বসা পাখি, এক ঝাঁক পাখি ইত্যাদি মোটিফরূপে চিত্রাঙ্কন, সূচিকর্ম, বয়ন, বুনন বা ভাস্কর্যে পরিলক্ষিত হয়। মাছ, হাতি, ঘোড়া, ময়ূর, বৃত্ত, স্বস্তিকা, মকর, বরফি, ধানছড়া, রথ, তাজিয়া, নৌকা, মন্দির, মসজিদ, পালকি, কুলা, ঝাড়ু, হুঁকা, পাখা, সাজি, বিন্দু, গরু, মানব-মানবী, বীজ, চাকা, লাঙল, মই, ঢেঁকি, বাঘ, হরিণ, আলপনা, পিঁপড়া, চন্দ্র,

নক্ষত্র, পানপাতা, সুপারিগাছ, রাধা-কৃষ্ণ, শিবলিঙ্গ, টিয়া পাখি, তালগাছ ইত্যাদি বিষয়কেও মোটিফরূপে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এসবের সাথে জাতির ঐতিহ্য, আচার, সংস্কার, প্রতীকচিন্তা ও সৌন্দর্যচেতনা বিজড়িত। এগুলো যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশের লোকশিল্পে স্থান করে নিয়েছে। এর কয়েকটির পেছনে কিছু ধর্মীয় সংস্কার; কিছু ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি, পবিত্রতা, সৌন্দর্য কিংবা সৌভাগ্যের সংস্কার ক্রিয়াশীল আছে এবং লোককলায় চর্চিত হয়ে আসছে (নির্মাল্য নাগ ২০০০ : ১৯–২১)।

এ সকল উপাদানই মোটিফ হিসেবে নাও উপস্থিত হতে পারে; কিছু কিছু উপাদান সাধারণভাবেই উপস্থিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ এখানকার অনেকগুলোই সাধারণ চিত্র হিসেবে গণ্য। আন্তর্জাতিকভাবে লোককাহিনির মোটিফগুলোর তালিকাকরণ সম্পন্ন হলেও লোকসংস্কৃতি বা লোককলার মোটিফগুলোর কোনো তালিকা প্রণীত হয়নি। এই মোটিফগুলো লোকশিল্পকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করে থাকে। এদেশে এই মোটিফগুলোর উৎস হিসেবে রয়েছে নকশিকাঁথা, নকশিশিকা, দারুশিল্প, মৃৎশিল্প, নকশিপাখা, আলপনা, ধাতব শিল্প ইত্যাদি। একটি আধারে একাধিক মোটিফের উপস্থিতি থাকতে পারে। যেমন ব্রতের আলপনায় প্রচুর মোটিফের সমাবেশ লক্ষ করা যায়। মোটিফগুলোকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার অবকাশ রয়েছে। ওয়াকিল আহমদ তাঁর বাংলার *চারু ও কারু লোকশিল্প* গ্রন্থে বেশ কিছু মোটিফের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। বাংলাদেশের চিত্রকলায় এসব মোটিফের ব্যবহার প্রাচ্যধারার ও দেশজতার ধারায় খুবই তাৎপর্যপূর্ণভাবে সংঘটিত হয়েছে। ওয়াকিল আহমদ যেসব মোটিফকে চিহ্নিত করে আলোচনা করেছেন, সেগুলোর কয়েকটির ব্যাপারে নিচে সংক্ষেপে প্রকাশ করা গেল। এসব মোটিফকে আমরা বাংলাদেশের চিত্রকলার চর্চায় বারবার প্রাসঙ্গিকভাবে ব্যবহৃত হতে দেখি।

১. **পদ্ম :** পদ্ম উপমহাদেশের অতি জনপ্রিয় এক ফুল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছাড়াও ধর্মীয় সংস্কার ও অনেক কিছুরই প্রতীক হিসেবে এটি এই অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি তথা সংস্কৃতিতে স্থান করে নিয়েছে। লক্ষ্মীদেবীর আসন, বুদ্ধেরও বিশ্রামস্থল। ফলে হিন্দু-বৌদ্ধ উভয় ধর্মের সংস্কৃতিতেই তা বিশিষ্টরূপে ব্যাপ্তিলাভ করেছে। তন্ত্রশাস্ত্রের সাথে এর রয়েছে যোগাযোগ। পদ্ম অনন্ত, জল, সূর্যের উদয়াস্ত, জীবন-মৃত্যু এবং ফ্রয়েডীয় চিন্তায় নারীর যোনিপ্রতীকরূপে কল্পিত হয়েছে। অজন্তার গুহাচিত্র এবং ভারতীয় চিত্রকলায় এর প্রচুর ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

২. **কলকা :** কলকা পারসিক সভ্যতাজাত ও মুসলিম সংস্কৃতির অবদান। এটি রেখাশ্রিত একটি ডিজাইন, যা আগুনের প্রতীকী ব্যঞ্জনা দেয়। জোড় কলকা চীনা সংস্কৃতিতে নারী-পুরুষের মিলনের প্রতীকরূপে চিহ্নিত হয়েছে। তবে এদেশীয় সংস্কৃতিতে জোড় কলকার চল নেই। শাড়ি, অলংকার, নকশিকাঁথা ইত্যাদিতে এর বহুল ব্যবহার দেখা যায়। শাড়ির আঁচল ও পাড়ে, কাঁথার চারপাশে, কানের

দুলের আঙ্গিক-গঠনে খুবই জনপ্রিয়। উপমহাদেশে একক ও সারিবদ্ধ কলকার রীতি প্রচলিত।

৩. **জীবনবৃক্ষ :** এটি জীবন্ত একটি বৃক্ষ, যা ফুল-ফল ধারণ করে আছে; সাধারণত কোনো নকশা যেমন নকশিকাঁথার কোনায় অবস্থান করে থাকে। এটি উর্বরতা, সজীবতা, প্রাণের প্রতীকরূপে প্রতিভাত হয়ে থাকে। প্রায়ই জীবনবৃক্ষের পাতা হিসেবে কলকার ব্যবহার রয়েছে; আবার কলকা থেকেও জীবনবৃক্ষের শাখা-প্রশাখা গজিয়েছে এমন দেখা যায়। পান, কদম, সূর্যমুখী, সরিষা ইত্যাদি গাছও জীবনবৃক্ষ হিসেবে অঙ্কিত হয়ে থাকে বা অঙ্কিত জীবনবৃক্ষটি ওই সব উদ্ভিদ বা বৃক্ষের রূপে প্রতিভাত হয়ে থাকে।

৪. **ধানের শিষ :** ধানের ছড়া বা গাছ বা শুধুই ধান নয়, তা সম্পদ ও সমৃদ্ধির প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকে। ব্রতের আলপনা ও নকশিকাঁথায় বহুল ব্যবহার আছে। লক্ষ্মীর প্রতিকরূপে এরও রয়েছে ভূমিকা। প্রায়ই যুগপৎ লক্ষ্মীর পদছাপ, লক্ষ্মীপেঁচা ও ধানছড়া একত্রে সহাবস্থান করে থাকে। গ্রামের বধূরা গলায় যে তাবিজ পরে, তার আকৃতি অনেক ক্ষেত্রেই ধানের বীজ বা ধানের সাথে তুলনীয় এবং এক্ষেত্রে কৃষিসমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থাকে।

৫. **ডাব :** ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে সজীব কলাগাছ, মঙ্গলঘট ইত্যাদি স্থাপন করা হয়ে থাকে। বিয়ে, হালখাতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এর ব্যবহার রয়েছে। কলাগাছ, আমপাতা, ডাব, সব মিলিয়ে কল্যাণ, সম্পদ, প্রজননের ব্যঞ্জনা তৈরি করে। জলপূর্ণ ঘট ও ডাব অন্তঃসত্ত্বা রমণীর প্রতীক।

৬. **পুষ্পিত লতা :** চিত্রিত আধারের কিনারায় সাধারণত এটি স্থান নেয়। শাড়ির পাড়, কাঁথা, দরজায় এর বহুল ব্যবহার আছে। একে ইচ্ছেমতো প্রলম্বিত করা যায়। ব্রতের আলপনায় পুষ্পিত লতা আবশ্যকীয় উপস্থিতি লাভ করে। এটি গলার হারেও ডিজাইন হিসেবে অবস্থান নেয়।

৭. **পেঁচানো ফুল ও রেখা :** এটিকে সাধারণত আলপনায় দেখা যায়। কাঁথার চারপাশের বর্ডারেও স্থান নেয়। পেঁচানো ফুলের মতোই পেঁচানো রেখার অস্তিত্ব রয়েছে। চলমান জ্যামিতিক রেখা বা রেখাসদৃশ লতার নকশা এটি। এটি ইসলামি সংস্কৃতিজাত মোটিফ। ব্যাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৮. **মোচড়া ফুল :** ঘূর্ণিসদৃশ একধরনের ডিজাইন। কেন্দ্র থেকে রেখাগুলো সমদূরত্বে বিস্তৃত। গোলকধাঁধা, চালতা ফুল, বাঘের পাড়া, সতিনের মোচড়া, ষষ্ঠীর চিহ্ন ইত্যাদি বলেও পরিচিত। বিমূর্ত ডিজাইনের কারণে এরূপ নামকরণের ভিন্নতা ঘটেছে। এটি সারিবদ্ধ বা ছড়ানো থাকে।

৯. **বুটি :** এটি একটি জ্যামিতিক নকশা। বুননশিল্পে, পাখায় ও পাটিতে এর ব্যবহার রয়েছে। বুনন কৌশলে বৃত্তাকার ও চতুষ্কোণ আকারে একে বিন্যস্ত করা হয়ে

থাকে। পাখার ক্ষেত্রে একটি বুটিকে কেন্দ্র করে আয়তাকার কয়েকটি খোপে বিন্যস্ত থাকে। তখন বুটিমণ্ডলের সৃষ্টি হয়।

১০. **বর্ফি :** রম্বসের আকারবিশিষ্ট ডিজাইন। পাখা, পাটি ইত্যাদি বাঁশ ও বেতের কাজে এই মোটিফ লক্ষণীয়। বুননের কৌশলে বর্ফির নকশা ফুটে ওঠে। ফারসি বর্ফ থেকে এর উৎপত্তি বলে ধারণা করা হয়।

১১. **বিন্দু ও বৃত্ত :** বিন্দু বা গোলক পানির প্রতিভাস জাগিয়ে তোলে। বৃত্তদল বা বৃত্তমণ্ডলের ব্যবহার লোকশিল্পে পাওয়া যায়। সহজিয়া তান্ত্রিক সাধনায় বিন্দু শুক্রবীজ হিসেবে প্রতিফলিত হয়। অর্থাৎ এর সাথে জীবনের সৃষ্টি সম্পর্কিত হয়ে পড়ে। বৃত্ত দেখলেই বৃত্তাবদ্ধতার ধারণা চলে আসে। কাঁথা, আলপনা, কাঠের কারুকাজে বৃত্তের সবিশেষ ব্যবহার রয়েছে।

১২. **বর্গক্ষেত্রে বৃত্ত :** বর্গের অভ্যন্তরে বৃত্তও একরকমের মোটিফ; এর সাথে বৌদ্ধস্তূপের সংস্কার জড়িত রয়েছে। জ্যামিতিক নকশাগুলোর ক্ষেত্রে সরাসরি এটি মাঝেমধ্যেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সীমার মাঝে অসীমের ধারণাও এর সাথে কমবেশি বিজড়িত।

১৩. **চাকা :** চাকা সভ্যতার অগ্রগতির প্রতীক। গতিশীলতার সাথে সমৃদ্ধি নির্দেশেও এর চিত্রায়ণ হয়ে থাকে নানাভাবে। সুদর্শন চক্র, অশোক চক্র, বৌদ্ধধর্মের ধর্মচক্র ইত্যাদি চাকার সাথে সম্পর্কিত সংস্কার। দালান, দরজা, বাক্স ইত্যাদিতে এর ব্যবহার রয়েছে।

১৪. **স্বস্তিকা :** একে শুভচিহ্ন, বজ্রচিহ্ন ইত্যাদি হিসেবে দেখা হয়। হিন্দুদের মাঙ্গলিক নানা অনুষ্ঠানে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মহেঞ্জোদারো ইত্যাদি সিন্ধু সভ্যতায় এর ব্যবহার ছিল বলে জানা যায়। ব্রতের আলপনা ও ঘরের দেয়ালে এটি আঁকা হয়। প্রায়ই এর চিত্রাঙ্কনে চারপাশে একটি করে বিন্দুসহ অঙ্কিত হয়ে থাকে।

১৫. **সূর্য :** মাঝে মাঝে খণ্ডিত সূর্যও অঙ্কিত হয়। সাধারণত এ মোটিফটি আধারের মাঝখানে চিত্রিত হয়। আবার পদ্ম ও সূর্য একত্রেও অঙ্কিত হয়। গোল বৃত্তকে কেন্দ্র করে চারপাশে রেখাঙ্কনের মাধ্যমে সূর্যের আবহ আনা হয়। সূর্যকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রাচীন মতামত ও সংস্কার আছে। জীবনের উৎস, আলো ও জ্ঞানের প্রতীকরূপে সূর্যের ব্যবহার আছে। সূর্য, খণ্ডিত সূর্যের মতো সূর্যগ্রহণের মোটিফও বহুল ব্যবহৃত।

১৬. **চাঁদ-তারা :** সৌন্দর্য ও স্নিগ্ধতার প্রতীকরূপেও লোকসংস্কৃতিতে এর ব্যবহার দেখা যায়। মুসলিম সংস্কৃতিতে চাঁদ-তারা বিশেষ স্থান দখল করে আছে। নকশিকাঁথা বা মসজিদের মিনারে একে দেখতে পাওয়া যায়। গাজী পীরের আশার মাথা চাঁদ-তারা আকৃতির হয়ে থাকে।

১৭. **ঘূর্ণি :** চক্রসদৃশ এই ডিজাইনটিকে নকশিপিঠা, কাঁথায় দেখা যায়। এর একটি কেন্দ্র থাকে, যার থেকে এর উৎপত্তি। চক্রাকারে আবর্তিত হয়ে বৃত্তমণ্ডল তৈরি করে। ঘূর্ণায়মান বিশ্বকে প্রতিফলিত করে।

১৮. **রাধাকৃষ্ণ :** রাধাকৃষ্ণ শক্তিশালী মোটিফ। মাঝে মাঝে আলাদা আলাদাভাবে চিত্রিত হলেও সাধারণত একসাথেই রাধা ও কৃষ্ণকে অঙ্কিত করা হয়। পটচিত্র, টেরাকোটা, নকশিকাঁথা, সরাচিত্র ইত্যাদি প্রায় সব লোকজ শিল্পে এই মোটিফের উপস্থিতি প্রচুর মাত্রায় বিদ্যমান।

১৯. **মা ও শিশু :** এককালে এই মোটিফ দৈবশক্তিসম্পন্ন বলে চর্চিত হলেও এখন শৌখিন খেলনায় বা পুতুলে পরিণত হয়েছে। মৃৎশিল্পের টেপা পুতুলের জগতে এর ব্যবহার সর্বাধিক।

২০. **পরী :** পরীর মোটিফ ভারতীয়, গ্রিক, মুসলিম সংস্কৃতিতে আছে এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় মোটিফ। প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতীকরূপে লোকমানসে ডানাওয়ালা পরীর অবস্থান আছে। দারুশিল্প, নকশিকাঁথায় এই মোটিফের উল্লেখ পাওয়া যায়।

২১. **টিয়া :** টিয়া অনেক সময় শুকপাখি নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। নকশিকাঁথা, কাঠের কাজ ইত্যাদিতে এ মোটিফটি পাওয়া যায়। টিয়ার ঐতিহ্য অনেক প্রাচীন।

২২. **ময়ূর :** পেখমের জন্য সৌন্দর্যের পাখি হিসেবে নন্দিত। লোকশিল্পের নানা শাখায় স্থান করে নিয়েছে। চিত্র, ভাস্কর্য, সূচিকর্মে সুদৃশ্য ময়ূর অঙ্কিত হয়ে থাকে। আবার জোড় ময়ূর, সাপ ও ময়ূরও মোটিফ হিসেবে লোকপ্রিয়।

২৩. **কবুতর :** অতীতে কবুতর সংবাদ আদান-প্রদানে কাজে দিত। শান্তির প্রতীক বলে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আয়োজনের শুরুতে কবুতর উড়িয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা সূচিত হয়। পাটি, নকশিকাঁথায় যেমন এর ব্যবহার আছে, চিত্রকলার লোকজ ধারাতেও একে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়।

২৪. **প্রজাপতি :** ময়ূরের মতোই সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে একে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। বাঙালিদের মধ্যে বিয়ের সাথে এই মোটিফের সংস্কার জড়িয়ে আছে। বিয়ের আসনের পিঁড়িতে জোড়া প্রজাপতি অঙ্কনের রীতি রয়েছে। নকশিকাঁথাতেও উড়ন্ত প্রজাপতির উপস্থিতি লক্ষণীয়।

২৫. **সাপ :** সাপ বাঙালি জীবনের নানা কিছুর সাথে জড়িয়ে আছে। সাধারণত উর্বরতা ও প্রজননের প্রতীক। মনসাকে সাপের দেবী বলে মান্য করা হয় এবং এর সাথে বেহুলা-লখিন্দরের বিখ্যাত কাহিনি জড়িয়ে আছে। শিবের সাথেও সম্পৃক্ততা আছে এবং ভয়ের যোগাযোগ আছে সাপের মোটিফে।

২৬. **ঘোড়া :** যুদ্ধের আবহ, গতিশীলতা ইত্যাদির প্রতিফলনে ঘোড়া মোটিফটির ব্যবহার হয়ে থাকে। পক্ষীরাজ ঘোড়া, দুলদুল, বোরাক ইত্যাদি কাল্পনিক ঘোরাগুলোও নানা কারণে এই অঞ্চলের লোকশিল্পে চিত্রিত হয়ে থাকে। মুসলিম সংস্কৃতিতে আবেগের এক গুরুত্ববাহী চেতনা ধারণ করে এই ঘোড়া মোটিফটি।

২৭. **বাঘ :** নকশিকাঁথায় বাঘের প্রচুর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। গাজী পীরের সাথেও বাঘের কিংবদন্তি রয়েছে। গাজী পীরের পটচিত্রে বাঘের ব্যবহার খুব বিখ্যাত।

২৮. **মাছ :** ব্রতের আলপনা, নকশিকাঁথা, কাঠের কারুকার্য, শখের হাঁড়ি-সরা ইত্যাদিতে এই মোটিফের উল্লেখযোগ্য লোকপ্রিয় ব্যবহার আছে।

২৯. **কুলা :** এটি মঙ্গলের প্রতীক হিসেবে ক্রিয়া করে থাকে। বাঙালি সংস্কৃতিতে কুলা খুবই গুরুত্ব পেয়ে থাকে। বিবাহে কুলার ব্যবহার আবশ্যক। কুলার চিত্র আলপনা ছাড়াও নানাবিধ লোককলায় স্থান পেয়ে থাকে।

৩০. **পালকি :** ব্রতের আলপনা, নকশিকাঁথা ইত্যাদিতে এর ব্যবহার লক্ষিত হয়। বিবাহে এর প্রয়োগ মর্যাদাপূর্ণ। বর-কনেসহ পালকির চিত্রায়ণ বাঙালি সংস্কৃতির অপরিহার্য অংশ হিসেবে এটিকে নানা লোককলায় মোটিফের মর্যাদা দান করেছে।

এ ছাড়া গরুর গাড়ি, মসজিদ, ঢেঁকি, কাঁকই, জাঁতি, হাঁস, কালী, নরনারী, কলসি কাঁখে পল্লিবালা, হাতি, নৌকা, পাশার ছক, পানপাতা, ময়না, হুঁকা, গরু, লাঙল, মই, জোয়াল, নানা জ্যামিতিক নকশা ও পশুপাখি ইত্যাদি বিশিষ্ট হয়ে আছে এদেশীয় লোকশিল্পের মোটিফের অঙ্গনে। সবকটিরই রয়েছে বিশেষ বিশেষ ব্যাবহারিক তাৎপর্য। আবার শুধু যে দেশজতা ও জাতীয়তাবোধের চেতনা থেকে এসব উপাদান চিত্রচর্চায় বারবার আসে, এমন নয়; মূর্ত-বিমূর্ত ও পাশ্চাত্য আধুনিক ধারায় যাঁরা বাংলাদেশে চিত্রকলার চর্চা করে একে এগিয়ে নিচ্ছেন, তাঁদেরও চিত্রকর্মে উপস্থিত হচ্ছে। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবেই চিত্রশিল্পে বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছে সেসব। বাংলাদেশের চিত্রকলায় দেশজতা যা ঐতিহ্যকে আলিঙ্গন করে বিকাশমান, সেখানে এ মোটিফগুলো নানা প্রতীকী তাৎপর্য লাভ করছে। বাংলাদেশে পরিচিত ও প্রচলিত মোটিফগুলোর উপস্থাপনে এখানকার আধুনিক চিত্রকলা সর্বজনের বোধগম্যতা, গ্রহণযোগ্যতা যেমন লাভ করতে সক্ষম হয়েছে, তেমনি ভারতীয় প্রাচ্যধারার চিত্রকলার উপধারা বা আঞ্চলিক ধারা হিসেবেও শক্তিশালী স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদায় অভিষিক্ত করছে। বিশ্ব চিত্রকলার আঙিনায়ও বাংলাদেশের চিত্রকলা হিসেবে চিহ্নিতকরণের উপায় ও উপাদান হিসেবে ক্রিয়া করছে।

১৯৫৩–৫৪ সালের দিকে জয়নুল আবেদিন ফিগারেটিভ যেসব কাজ করেছিলেন সেখানে দেখা যাচ্ছে চিবুক ত্রিকোনাকৃতির হয়ে যাচ্ছে; ময়মনসিংহের পুতুলের ফর্ম থেকে তিনি সেটি নিয়েছিলেন। লক্ষ্মীর সরার কাঠামো শিল্পী রশিদের চিত্রকলার ভিত্তিতে অটুট ছিল। কাইয়ুম চৌধুরীর কাজের জ্যামিতিক বিন্যাস জামদানি শাড়ি থেকে আহৃত বলেই মনে হয়। তাঁর কাজে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে জামদানির পাখি, পাতা, ফুলও। রাজশাহী অঞ্চলের শখের হাঁড়ির প্রেরণাও তাঁর ক্ষেত্রে কাজ করেছে। শখের হাঁড়ি থেকে পাখি, মাছ ইত্যাদিকে নিয়েছেন কামরুল হাসানও।

শম্ভু আচার্যের চিত্রকলায় লোকজ মোটিফ

চিত্র : আবদুস শাকুর শাহর চিত্রকলায় লোকজ মোটিফ

ঐতিহ্যাশ্রয়ী চিত্রকলায় রূপ বা বিষয় কালে কালে অপরিবর্তিত আকারে ধারাবাহিকতা অর্জন করে। অজন্তা চিত্রশৈলী বৌদ্ধদের দ্বারা যুগ যুগ ধরে চর্চিত হয়েছে। মুঘল চিত্রকলা, পটচিত্রও তা-ই; দীর্ঘ কালবাহিত উত্তরাধিকার নিয়ে এগুলো চলছিল। বিষয় নির্বাচন ও রূপনির্মাণের দিক থেকে প্রায় অপরিবর্তিতভাবে পরম্পরা ধরে চলমান ছিল; কোনো কোনো ক্ষেত্রে আজও চলছে। গুরুশিষ্য পরম্পরার মতোই নির্দিষ্ট চিত্রাদর্শ ও চিত্রশৈলীকে মেনে শিল্পীরা এর চর্চা করে থাকে। শিল্পীর স্বাধীনতা এক্ষেত্রে সীমিত। মধ্যযুগের ইউরোপীয় খ্রিষ্টান ধর্মানুসারী চিত্রকলার চর্চা কিংবা তিব্বতীয় চিত্রকলার ঐতিহ্যবাহী ধারাটি এর দৃষ্টান্ত হতে পারে, যেখানে নির্দিষ্ট ধারার শিল্পশাস্ত্রের নির্দেশ শিরোধার্য।

বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলায় লোক-ঐতিহ্যের প্রভাব

পঞ্চাশের দশকে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের যেসব শিল্পী এদেশে প্রাতিষ্ঠানিক, একাডেমিক ধারার চিত্রকলার বুনিয়াদ গঠন করেন, তাঁদের অনেকেই চল্লিশের দশকেই চিত্রশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। কলকাতার নব্যবঙ্গীয় আন্দোলনের দ্বারা তাঁরা প্রভাবিত হলেও এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে চর্চা করলেও পৌরাণিক আবহ বা অজন্তা-ইলোরা ও মুঘল কিংবা দূরপ্রাচ্যের কোনো আঙ্গিকের প্রতি তাঁদের আস্থা ছিল না। নাগরিক জীবনের রূপায়ণের প্রতিও তেমন আগ্রহ তাঁরা দেখাননি; কারণ মুসলিম চিত্রশিল্পীদের সিংহভাগই গ্রামের লোক ছিলেন। ফলে তাঁদের মধ্যে লোকায়ত সংস্কৃতির রূপায়ণের একটা প্রবণতা ছিল। বাংলাদেশের চিত্রকলা পঞ্চাশের দশকে এসে আধুনিকতাকে আত্তীকরণ করে। বাস্তববাদী চিত্রকলার এবং রূপান্তরমূলক শৈলীর দিক থেকে যাত্রা করে মানব-অবয়বের স্টাইলাইজড উপস্থাপনায় নিসর্গের সরলীকৃত রূপায়ণের পাশাপাশি আধুনিক আঙ্গিকের সাথে লোকজ ফর্মের সংমিশ্রণ ঘটে (নজরুল ইসলাম ২০১৯ : ২৫৩)। নিরীক্ষাধর্মী এসব কাজের পেছনে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, সফিউদ্দীন আহমেদ প্রমুখের কথা বলা যায়। বাংলার চিত্রকলার আঙ্গিকগত আধুনিকায়নে তাঁরা সচেষ্ট হয়েছিলেন। আমিনুল ইসলাম, হামিদুর রাহমান, নভেরা আহমেদ প্রমুখ ইউরোপীয় আঙ্গিকে নতুন শিল্পকলার সঞ্চার করেন। রশীদ চৌধুরী, মোহাম্মদ কিবরিয়া ছিলেন বিমূর্ত ধারার শিল্পী। অর্থাৎ নিরীক্ষার একটা পর্ব এই সময়টিতে এদেশের চিত্রকলায় চলছিল। পাকিস্তান পর্বে বাংলাদেশের চিত্রসাধনা ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। শহিদ মিনারকেন্দ্রিক তৎপরতার বাইরে ছয় দফার আগ পর্যন্ত তা একরকমের অরাজনৈতিকও ছিল বলা চলে। তবে ১৯৬৫ সালের পর এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। গণ-অভ্যুত্থানের ভালো রকমের প্রভাব পড়ে তৎকালীন চিত্রকলার বিষয়বস্তুর ওপর। জয়নুল আবেদিনের ‘নবান্ন’ স্ক্রলচিত্রের কথা বলা যায়। ‘সোনার বাংলা শ্মশান কেন’-কেও এ প্রেক্ষিতে উল্লেখ করা যেতে পারে। ‘বিদ্রোহী’ ও ‘রাগী তরুণেরা’-এর নিষ্প্রভ উপস্থিতির পরের ‘মনপুরা-৭০’ সেই

সময়ের শিল্পাচার্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যা স্বাধীনতাযুদ্ধের সামান্য আগে ভালো রকমের আবেদন তৈরি করতে পেরেছিল। যুদ্ধকালীন কামরুল হাসানের 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে' ব্যাপক উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। তবে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন চিত্রকলার সূচনা এদেশে ঘটে মূলত স্বাধীনতার পরে। মুক্তিযুদ্ধের মতো বিরাট ঘটনা থেকে এদেশের শিল্পীদের বিযুক্ত থাকার সুযোগ ছিল না; অনেকেই প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। শিল্পী শাহাবুদ্দিনের কথা ধরা যায়। স্বাধীনতার পরে মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমাজ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে শিল্পীদের অনেকে বক্তব্যপ্রধান চিত্রকলার চর্চা করেছেন। সেই সময়ে চিত্রকলার পাশাপাশি ভাস্কর্যের চর্চাও গতিশীলতা লাভ করেছিল। নিতুন কুণ্ডু মুক্তিযুদ্ধের সময়ে শিল্পচর্চায় বিশেষ অবদান রেখেছিলেন। শিল্পীগণ যাঁরা যুদ্ধোত্তরকালে বাংলাদেশের চিত্রকলায় অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে প্রবীণ শিল্পী হিসেবে আছেন সফিউদ্দীন আহমেদ, এস এম সুলতান, আমিনুল ইসলাম, কাইয়ুম চৌধুরী, রশীদ চৌধুরী, মুর্তজা বশীর প্রমুখ (নজরুল ইসলাম ২০১৯ : ২৫৫)। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের তরুণ শিল্পীদের মধ্যে উত্তরাধুনিক শিল্প-আঙ্গিক প্রবণতা হিসেবে কাজ করেছে; পরাবাস্তবতা, বিমূর্ততা, কার্টুনধর্মিতা উচ্চকিত হয়েছে। নারী শিল্পীদের কাজের মধ্যে নারীবাদী প্রবণতাসমূহের আত্তীকরণ ঘটেছে। আরো পরে ইনস্টলেশন আর্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিককালে মিশ্র ও ডিজিটাল মাধ্যমে কাজের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে। জয়নুল আবেদিন আধার হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের আগের বছরেই স্ক্রলচিত্রের সূচনা ঘটিয়ে চিত্রশিল্পকে ক্যানভাস থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। ইনস্টলেশন আর্টের ক্ষেত্রে শিল্পী অশোক কর্মকার, ঢালী আল মামুন, লালা রুখ সেলিম, মাহবুবুর রহমান, তৈয়বা বেগম লিপি প্রমুখ খ্যাতি লাভ করেছেন চমৎকার উপস্থাপনের মাধ্যমে। আর ডিজিটাল মাধ্যমে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে নাম করেছেন শিল্পী অসীম হালদার, তৈয়বা বেগম লিপি, নাজিয়া আন্দালিব প্রিমা প্রমুখ।

উপনিবেশোত্তর সময়ে, ভূখণ্ডগত স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের অর্থাৎ পাকিস্তান আমলের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বৈশিষ্ট্য হিসেবে যে ব্যাপারগুলো এদেশের চিত্রকলায় ক্রিয়াশীল ছিল, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখ করার মতো কিছু প্রবণতা হলো—

ক. জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান প্রমুখের লোকজ ঐতিহ্যভিত্তিক আধুনিক আঙ্গিকের চিত্রকলার চর্চা, খ. প্রকৃতি ও নিসর্গভিত্তিক বাস্তববাদী চিত্রকলার চর্চা, গ. পাশ্চাত্য আধুনিক ধারার সমকালীন চিত্রকলা হিসেবে কিউবিস্ট, বিমূর্ত, পরাবাস্তববাদী ধারায় চিত্রচর্চা এবং ঘ. শুদ্ধ বিমূর্ততাকে ক্যানভাসে রূপায়িত করার চর্চায় মগ্ন আরেকটি চিত্রচর্চার ধারা।

নজরুল ইসলাম তাঁর 'বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা স্বাধীনতার আগে ও পরে' প্রবন্ধে স্বাধীন বাংলাদেশের চিত্রকলাকে আধার ও আধেয়ের দিক থেকে কয়েকটি প্রবণতামুখিন ধারায় বিশ্লেষণ করেছেন। প্রবণতার নিরিখে সেগুলোর আলোচনা এমন হতে পারে—

জীবনমুখী বাস্তববাদী, পরাবাস্তববাদী চিত্রকলা : সুলতানের গ্রামীণ কৃষিনির্ভর সমাজের আখ্যানগুলোর চিত্রায়ণ, শিল্পী শাহাবুদ্দিনের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চিত্রগুলো, নাগরিক নারীকেন্দ্রিক চিত্রায়ণ হিসেবে নাজলী লায়লা মনসুরের কাজগুলো এবং কনকচাঁপা চাকমার আদিবাসী জীবনের প্রধানত নারী-আলেখ্য নির্মাণের প্রয়াসগুলো ইত্যাদি।

প্রকৃতি ও নিসর্গনির্ভর বাস্তববাদী, পরাবাস্তববাদী ও প্রতীকী চিত্রকলা : আব্দুর রাজ্জাক, কাইয়ুম চৌধুরী, হাশেম খান, মনিরুল ইসলাম, রফিকুন নবী, নাসরিন বেগমের অনেকগুলো কাজ এই ধারার মধ্যে পড়ে।

লোক-ঐতিহ্যভিত্তিক আধুনিক চিত্রকলা : জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসানদের চিত্রকলার এই প্রবণতাকে তরুণ শিল্পীদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে অগ্রগামী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন শিল্পী আবদুস শাকুর। লোকসাহিত্য দ্বারা এই ধারার অনেক শিল্পী প্রভাবিত হয়েছিলেন। নকশাপ্রধান চিত্র-আঙ্গিক এক্ষেত্রে গুরুত্ব পেয়েছে অনেকের কাজে। শিল্পী শাকুরের এই ধারার কাজে পরাবাস্তবধর্মিতাও স্থান করে নিয়েছে।

বিমূর্ত চিত্রকলা : স্বাধীনতার পূর্বেই এই ধারাটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে শক্তিশালী প্রবণতা হিসেবে বাংলাদেশের চিত্রকলায় স্থান করে নিয়েছিল। আমিনুল ইসলাম, মুর্তজা বশীর প্রমুখ পাকিস্তান আমলে বিমূর্তপ্রবণ চিত্রকলার চর্চা করেছিলেন। মোহাম্মদ কিবরিয়া এই ধারার একজন প্রধান ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। স্বাধীনতার পরে মনিরুল ইসলাম, আবুল বারক আল্‌ভী, মোহাম্মদ ইউনুস প্রমুখ শিল্পীর কাজের প্রধান প্রবণতা হলো এই বিমূর্ততা।

রাজনৈতিক চিত্রকলা : যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে শিল্পী শাহাবুদ্দিন, শিশির ভট্টাচার্য, নিসার হোসেন প্রমুখ ব্যক্তি রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন আঙ্গিকের চিত্রকলার চর্চা করেছেন। শিল্পী হাশেম খান ও কাইয়ুম চৌধুরীর চিত্রকলায় এই প্রবণতা বিদ্যমান।

নারীবাদী চিত্রকলা : স্বাধীনতার পরের চিত্রকরদের মধ্যে কামরুল হাসান, সুলতানের চিত্রকলায় নারীর সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। যুদ্ধোত্তর নারী শিল্পীদের কাজের মধ্যে এই প্রবণতা বিস্তৃত ও বহুমাত্রিক হয়েছে। ফরিদা জামান, রোকেয়া সুলতানা, নাজলী লায়লা মনসুর, কনকচাঁপা চাকমা, তৈয়বা বেগম লিপি, নাজিয়া আন্দালিব প্রিমা এক্ষেত্রে স্মরণীয়।

ইনস্টলেশন ও ভিডিও মাধ্যম : ইনস্টলেশন ও ভিডিও মাধ্যমের গ্রহণযোগ্যতা সাম্প্রতিককালে তৈরি হয়েছে। নতুন নতুন আঙ্গিক, ফর্ম, মাধ্যম, বিষয়ের চর্চার প্রেক্ষিতে মিশ্র মাধ্যমের কাজের প্রতিও সমসাময়িক শিল্পীদের আগ্রহ দেখা যায়; তাঁরা এক্ষেত্রে সাফল্যও লাভ করছেন।

আর্য-অনার্য, কোল-ভিল-মুণ্ডা-সাঁওতাল, শক-হুন-মুঘল-পাঠানের রক্তধারা ও সংস্কৃতি এদেশের জনমানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। আবার যুগে যুগে বাংলা অঞ্চল

সর্বভারতীয় বিশেষত মধ্যযুগের দিল্লির শাসনের বিরোধিতা করে এসেছে এবং একরকমের স্বায়ত্তশাসন ভোগ করেছে; সার্বক্ষণিক প্রদেশ হিসেবে বশ্যতা স্বীকার করেনি। উপনিবেশোত্তর বাংলা ভাগ যদিও বাঙালি মুসলমানের জাতিগত বিকাশে, বিশেষত মধ্যবিত্তের বিকাশে সবিশেষ ভূমিকা রেখেছে, কিন্তু সাংস্কৃতিক ঐক্যকে বিনষ্ট করেছে বৃহত্তর ভাষাভিত্তিক বাঙালি জনসমাজের। বাঙালি মুসলমানের বিশ শতকের সবচেয়ে বড় অর্জন ধরা যেতে পারে বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্র গঠনকে। এই রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়ায় প্রথম দিকে তারা প্যান-ইসলামিক ভ্রাতৃত্বের চর্চা করলেও, ক্রমশ জাতি হিসেবে আরো স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত হয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদকেই তাত্ত্বিকভাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ফলে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাষ্ট্র গঠনে যখন যুক্ত হয়েছিল, তারা আশ্রয় করেছিল লোকজীবনের সংস্কৃতিকে। শিল্পীগণও যুক্ত হয়েছিলেন তাদের এই প্রক্রিয়ায় এবং তাঁরা তাঁদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অগ্রসর অংশ হিসেবে শিল্পকলার মাধ্যমে নেতৃত্ব দিতে ও প্রভাবিত করতে অনুসন্ধান করেছিলেন বাংলাদেশের লোকায়ত সংস্কৃতির নির্যাসের। বলা হয়ে থাকে, প্রাচ্য বরাবরই অন্তর্মুখিন, অনুভূতিপ্রবণ ও আধ্যাত্মিকতায় নিমগ্ন থেকেছে; আর পাশ্চাত্য ছিল প্রকাশবাদী, বহির্মুখিন ও বস্তুতান্ত্রিকতার সাধনায় তৎপর। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিল্পে নিজস্ব জমিনে দাঁড়ানোর জায়গা খুঁজে নিয়েছিলেন। অজন্তা-ইলোরা-মুঘল চিত্রধারার প্রবাহকে তিনি আধুনিক শৈল্পিক জমিনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে ভারত তথা প্রাচ্যশিল্পের ষড়ঙ্গ তাকে সবিশেষ সহায়তা করেছে। প্রাচ্যচিত্র মূলত ওই সময়ে পুনর্জাগরণবাদী ঐতিহ্যের আলোকে বিকাশমান ছিল। আর আমাদের দেশে প্রাচ্যকলা গড়ে উঠেছে লোকশিল্পের জাগরণের মধ্য দিয়ে। জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান প্রমুখ শিল্পীর কাজে দেখা যায় প্রাচ্যকলার সাথে লোকশিল্পের মেলবন্ধন। জয়নুলের দুর্ভিক্ষের চিত্রাবলিকে শিল্পবেত্তাগণ প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সফল মেলবন্ধন বলে স্বীকার করেন (জাহিদ মুস্তফা ২০১৪ : https://www.kaliokalam.com)।

জয়নুল আবেদিন পঞ্চাশের দশকে ঢাকায় চলে আসার পর তাঁর চিত্রচর্চায় রূপান্তর ঘটে। তিনি আজীবন লোকজীবনের আবেগ-অনুভূতি দ্বারা আক্রান্ত ছিলেন। তখন নতুন করে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার ভিত্তি স্থাপনের পাশাপাশি তিনি লোকজ মোটিফ নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। পূর্ব বাংলার মানুষ, প্রকৃতি, পশুপাখি নিয়ে তেলরং, জলরং ও টেম্পোরায় কাজ করে যাচ্ছিলেন। অসামান্য দক্ষতার সাথে তিনি প্রাচ্যধারার ও একই সাথে পাশ্চাত্যধারার শিল্পচার্চারও প্রয়াস নিয়েছিলেন এবং নিজস্ব ধরন এক্ষেত্রে তৈরি ও এর বিকাশ ঘটাতে পেরেছিলেন। বলা আবশ্যক, তাঁর একাডেমিক পাশ্চাত্য রীতিতে সিদ্ধহস্ত চিত্রচর্চায় অবনীন্দ্রনাথদের প্রভাব পড়লেও তা ছিল অনেক বেশি স্বতন্ত্র। প্রাচ্যকলার মার্গীয় চিত্র বা পারস্য প্রভাবের মুঘল মিনিয়েচার তা ছিল না; ছিল একান্তই লোকজীবনের অনুষঙ্গে অঙ্কিত বিশেষ এক ধারা। তাঁর ‘পাইন্যার মা’ প্রভৃতিতে এই রূপটি অবলোকন করা যায়। দুর্ভিক্ষের সময় বাজারে উন্নতমানের কালি-তুলি যখন

দুর্লভ ছিল, সেই সময়ে তিনি কালো চীনা কালি আর কার্টিজ পেপার, প্যাকেজিং কাগজের ওপর ছবি আঁকতেন।

> জয়নুল আবেদিন লোকশিল্পের আদলে ছবি আঁকতে গিয়ে লোকজ মোটিফগুলোকে হুবহু ব্যবহার করেননি। রঙের ব্যাপারেও লোকজ ছবির কাঁচা রঙকে পরিহার করেছেন। সেইসঙ্গে টোনাল তারতম্যও ব্যবহার করেছেন প্রয়োজনে। তিনি অনুকরণকে প্রশ্রয় দেননি এবং ফর্মগুলোকে সহজ করে এক ধরনের আধুনিক রূপ দিয়েছিলেন। আবার বিষয় বাছাইয়ে পূর্ব বাংলার বৈশিষ্ট্য যেন থাকে এমন সব পরিচিত দিককে গ্রহণ করেছিলেন জয়নুল। যেমন দেখা যায় তাঁর নিজের আঁকা *গুণটানা*, *প্রসাধন*, *পাইন্যার মা*, *চারটি মুখ*, *দুই মহিলা* তাঁর প্রিয় চিত্রকর্ম ছিলো। পাশাপাশি একই সময়ে জয়নুল কালি ও তুলি আর খাগের কলমে এঁকেছেন ভিন্নধর্মী চরিত্র। এই আঙ্গিকটি জয়নুলের ভীষণ প্রিয় ছিলো (আহমাদ ইশতিয়াক ২০২১ : https://bangla.thedailystar.net)।

উল্লেখিত ধারার ছবিগুলোর মধ্যে আমরা দেখি *সাঁওতাল দম্পতি*, *সাঁওতাল রমণীদ্বয়*, *মই দেওয়া*, *সংগ্রাম*, *বিদ্রোহী* প্রভৃতিকে। দেশ-বিদেশে ঘোরাঘুরির সুবাদে তিনি কিছু স্কেচধর্মী ছবিও এঁকেছিলেন। তিনি জলরঙে ছবি আঁকতে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন। তাঁর *নবান্ন* ও *মনপুরা-৭০* চিত্রকর্ম দুটি স্ক্রলচিত্র। পরিপ্রেক্ষিতকে গৌণ করে দিয়ে মোটা তুলি ও স্পেস ব্যবহারে জয়নুল আবেদিন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি লোকশৈলীর সাথে সংশ্লেষিত করেছিলেন জ্যামিতিক বিন্যাসকে।

শিল্পী কামরুল হাসানের চিত্রকর্মের বিষয় হিসেবে বরাবরই স্থান করে নিয়েছিল মানুষ, স্বাদেশিকতা, দেশীয় ঐতিহ্য। গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের জীবন ও বাঙালি নারীদের ছবিতে তিনি এদের চিরন্তন রূপকে তুলে ধরতেন। তাঁর ছিল এক প্রতিবাদী চরিত্র; তিনি সামাজিক অন্যায়, নিপীড়নের বিপরীতে বলিষ্ঠভাবে মানুষের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, স্বাধীনতা ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে রূপদান করতে সদাতৎপর ছিলেন। প্রত্যক্ষতা ও অনিবার্যতা তাঁর চিত্রের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। লোকজধারার চিত্রসাধনায় তিনি পূর্ব পাকিস্তান ও তৎপরবর্তী বাংলাদেশে ছিলেন জীবন্ত কিংবদন্তি। লোকবৈশিষ্ট্য তাঁর চিত্রমেজাজে নিরন্তর ক্রিয়া করে গেছে এবং তিনি লোকচিত্রের নানা উপাদান-উপকরণকে এদেশের চিত্রকলার চর্চায় ব্যবহার করেছেন। প্রাচ্যধারার চিত্রকলার বৈশিষ্ট্যগুলো যেমন বৃত্তাকার কম্পোজিশন, বহুমাত্রিকতা, পরিপ্রেক্ষিতের ব্যবহার দেখা যায়। সহজ-সরল নকশা, সংক্ষিপ্ত রেখা, ফ্লাট বর্ণারোপ করতেন। পটচিত্রের অনুকরণে তিনি উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার করতেন। উজ্জ্বল রঙে ও বলিষ্ঠ রেখায় ছবিকে অলংকরণধর্মী করতেন। তাঁর অনুপ্রেরণার জায়গা ছিল লোকজ চিত্রকলা, ভাস্কর্য, পুতুল ও অপরাপর কারুকলা। ঐতিহ্যবাহী পুতুলকে তিনি *তিন কন্যা*, *গুণটানা* ইত্যাদির চিত্রায়ণে ব্যবহার করেছিলেন দক্ষতার সাথে। তাঁর চিত্রবস্তুতে মানব অবয়বের চিত্রায়ণে

ভরাট শরীর, দীর্ঘ গ্রীবা, চোখ-নাক অঙ্কনে লোকজ মোটিফের প্রতিফলন রয়েছে। এরই সাথে তিনি সংশ্লেষিত করেছেন কিউবিজমকে।

মাধ্যম হিসেবে তিনি জলরং, তেলরং, ওয়াশ, টেম্পোরা, ছাপচিত্র, এচিং, কাঠখোদাই, সেরিগ্রাফ, লিথোগ্রাফ, লিনোকাট প্রভৃতি বৈচিত্র্যপূর্ণ মাধ্যমে কাজ করতেন। শিল্পী কামরুল হাসানের মধ্যে ব্রতচারী আন্দোলনের প্রভাব ক্রিয়াশীল ছিল। নিজেকে যামিনী রায়ের মতোই পটুয়া বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করতেন। তাঁর চিত্রসাধনার বিচিত্র আধারে লোকায়ত সংস্কৃতিকে আধেয় করে তুলতেন। জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রাম ও গণ-আন্দোলনগুলোতে তাঁর ছিল স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন বাংলাদেশের সংবিধানের অলংকরণ করেছিলেন; আর কামরুল হাসান নকশা করেছেন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার। এ থেকে এ দুই শিল্পীর কর্মের আধার ও আধেয় নির্ণয়ের বিশিষ্ট প্রবণতাকে বোঝা যায়, যেখানে তাঁরা আমাদের জাতীয় জীবনের সাথে ছিলেন গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। তবে বিশেষভাবে কামরুল হাসানের ক্ষেত্রে বলতে হয়, বাংলাদেশের চিত্রকলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের প্রধান দিকটি নিঃসন্দেহে আধুনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রচর্চায় গ্রামবাংলার লোকায়ত বিষয়বৈচিত্র্য ও ফর্মগুলোকে সংযুক্ত করতে পারা। স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বাপর বাংলাদেশে রাজনৈতিক চিত্রকলার উদ্ভাবন ও চর্চায় নেতৃস্থানীয় পথপ্রদর্শক হিসেবে তাঁর ভূমিকার কথা মাথায় রেখেও এ কথা বলা চলে।

বাংলাদেশের চিত্রকলার চর্চায় যাঁরা দেশীয় বিষয়কে আন্তর্জাতিক ও সর্বজনীন রূপদানে দক্ষতা দেখিয়েছেন অর্থাৎ স্থানীয় হয়েও যাঁদের চিত্রকর্মগুলো বিশ্বজনীনতা অর্জন করেছে, তাঁদের একজন এস এম সুলতান। কি আধার কি আধেয়—দুই দিক থেকেই তাঁর চিত্রকলা বিশিষ্ট দেশজতার পরিচয়বাহী।

কামরুল হাসানের সমসাময়িক একজন শিল্পী হলেন এস এম সুলতান। তাঁর চিত্রকর্ম একরকমের আপাত অপটুত্বের আভাস দেয় এবং নাগরিক পপুলার আর্টের মেজাজ বহন করে; যদিও বিষয়বস্তু একান্তই গ্রামীণ। প্রকৃতির সাথে সংগ্রামরত আদিপ্রকৃতির অসংস্কৃত কৃষক নারী-পুরুষ, যারা মূলত পল্লিপ্রকৃতির অপরাজেয় মানবসত্তা হিসেবে আবহমান কাল ধরে মৃত্তিকার ওপর তাঁদের অধিকার বজায় রেখেছে। প্রচলিত বাস্তবানুগতার প্রায়োগিক কুশলতার অভাবের পরেও দর্শকচিত্তে শক্তিশালী আবেদন তৈরি করতে পারার জন্য তাঁর শিল্পকর্ম বিশিষ্টতা পেয়েছে। আধেয় হিসেবে বাংলার কৃষক ও কৃষিজীবনকে বেছে নিলেও পাশ্চাত্য রেনেসাঁ ধারার মহাকাব্যিক বিস্তার তাঁর চিত্রপটের বৈশিষ্ট্য। তাঁর এসব চিত্রকর্মে আধুনিক জীবনের কোনো উপাদানের উপস্থিতি থাকে না, তাঁর অঙ্কিত চিত্রকলা বাংলার কৃষককেও ঠিক প্রতিনিধিত্ব করে না; বরং সভ্যতারই সকল ভূমিজ কৃষকের প্রতিরূপ তৈরি করে। তাঁর *চর দখল* বাংলার গ্রামীণ কৃষকের মরণপণ লড়াইকে মহত্ত্ব দেয়; কিন্তু প্রথম বৃক্ষরোপণ

আদিমানবের আত্মার ভাষাকেই ব্যক্ত করে থাকে। লোকশিল্পের মতোই তাঁর ছবির বিষয়বস্তু পৌনঃপুনিক।

শিল্পীরা যে ধারাতেই কাজ করে থাকুন না কেন সাধারণ প্রবণতা হিসেবে তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেরই কাজে স্থান করে নিয়েছে দেশীয় উপাদানগুলো। ইতিহাস-ঐতিহ্য, লোকজ মোটিফ, স্বদেশচেতনা দ্বারা তাঁরা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং এখনো যাঁরা প্রতিনিয়ত নানা আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মগ্ন তাঁদের কাজেও অনবরত জায়গা করে নিচ্ছে দেশজ বিষয়বস্তু। আধুনিকতাকে আয়ত্ত করতে গিয়ে আন্তর্জাতিকতাবোধে তাঁরা দীক্ষা নিলেও ভুলে যাননি বাংলাদেশের সমকালীন সমাজবাস্তবতা। বরং দিনে দিনে তাঁদের কাজে প্রতিভাত হচ্ছে মাটি ও মানুষের আখ্যান, গ্রামবাংলার প্রকৃতি, নিসর্গ, জনমানুষের আকাঙ্ক্ষা। বাংলাদেশের শিল্পীদের কাজের বিমূর্ততা, পরাবাস্তবতা ও অন্যান্য প্রবণতা এদেশেরই আধেয়কে কেন্দ্র করে রূপলাভ করছে। কেউ হয়তো লোকজ পূর্ববঙ্গের গীতিকা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে চিত্রসাধনা করছেন; দেখা যাচ্ছে তাঁর মানব অবয়বের বর্ণলেপনে পরাবাস্তবতার ছায়াপাত ঘটেছে। যেমন আবদুস শাকুরের কাজে। তিনি ময়মনসিংহ গীতিকার পাত্র-পাত্রীদের ছবি এঁকেছেন। মহুয়া, মলুয়া, নদের চাঁদ, চন্দ্রাবতী, কমলা, কাজলরেখার ছবি আঁকতে গিয়ে তাদের শারীরিক বর্ণের ক্ষেত্রে পরাবাস্তব রঙের প্রয়োগ করেছেন। প্রয়োজনানুযায়ী তাতে যুক্ত করেছেন লোকশিল্পের নানা আধার থেকে আহরিত নকশা। গীতিকার পদ ও উদ্ধৃতিকে ক্যালিগ্রাফির মাধ্যমে ব্যবহার করেছেন। অ্যাক্রিলিক, প্যাস্টেল, জলরং, কালি-কলমে তিনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে অবলম্বন করে দীর্ঘদিন ধরেই বেশ কিছু ছবি এঁকেছেন। ছবিগুলো মূলত কাগজে অঙ্কিত রেখাচিত্র। আবার কেউ আধা বিমূর্ত চিত্রকলার চর্চা করছেন পার্বত্য আদিবাসী নারীর জীবনকে উপলক্ষ করে। এ রকম করে দেশজতা ও আধুনিকতা এমনকি উত্তরাধুনিকতার সংশ্লেষ ঘটছে সাম্প্রতিক বাংলাদেশের চিত্রকলায়। ছাপচিত্র, ভাস্কর্য, প্রাচ্যকলা, স্থাপত্যবিদ্যা, ডিজিটাল মাধ্যম ইত্যাদি নানা আধারে ও আধারের নিরীক্ষাগত অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সমসাময়িক জীবনবাস্তবতাকে রূপদানের মাধ্যমে ক্রমে বাংলাদেশের চিত্রশিল্প বৈশ্বিক হয়ে উঠছে। শৈলীগত উৎকর্ষের সাথে সাথে কারিগরি দক্ষতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে সবই আশার কথা; কিন্তু নিরাশাও পিছু ছাড়ছে না। আন্তর্জাতিকতার নামে পাশ্চাত্যের অনুকরণসর্বস্বতা বা ঐতিহ্যের নামে পশ্চাৎপদতার চর্বিত-চর্বণ এবং নিরীক্ষার নামে দেশ-মাটি-মানুষের থেকে অসংলগ্নতার পরিচয়ও বর্তমান। বর্তমানে বিশুদ্ধ দেশজতার সন্ধান করতে যাওয়া যেকোনো অঞ্চল, দেশ বা রাষ্ট্রে একটি অবান্তর অন্বেষা। দেশীয় ও বিজাতীয় সংস্কৃতির মেলবন্ধনের এই যুগে যেখানে আমরা সকলেই অন্তত পুঁজিপ্রবাহের বিশ্বায়নের সাথে যুক্ত, সেখানে অত্যন্ত জটিলভাবে আধার ও আধেয়ের মধ্যকার সম্পর্ক নিরূপিত হয়। দেশীয় আধারে অ-দেশজ আধেয় কিংবা দেশজ আধেয়ের রূপদান নির্ধারণে বিদেশি ফর্মের প্রাধান্য শিল্পক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। সেই আবেদনও বর্তমান বাংলাদেশের শিল্পক্ষেত্রে,

বিশেষত চিত্রকলায় সীমিত মাত্রায় হলেও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। ফলে ফর্ম ও কনটেন্টের দেশজতার আলোচনায় অবধারিতভাবে প্রবেশ করে বিদেশাগত বিষয় ও রূপসাধনার ধারা।

শিল্পকর্মকে জনমানুষের জন্য সহজপ্রাপ্য করতে ছাপচিত্রের রয়েছে গুরুত্ববহ ভূমিকা। ছাপচিত্র একসময় শুধু সাদাকালোই হতো; ইদানীং রঙিন ছাপচিত্রের প্রচলন ঘটেছে। সাদাকালোতে চিত্রিত কাঠখোদাই-ই ছিল এককালের ছাপচিত্রের ধারা। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ছাপচিত্রের প্রথম দিককার প্রবাদপুরুষ ছিলেন শিল্পগুরু সফিউদ্দীন আহমেদ। তখনকার সময়ে টেকনিক হিসেবে তা ছিল সবচেয়ে আধুনিক। বাংলার জনজীবন থেকে নেওয়া পানি, মাছ, চোখ, নৌকা তাঁর চিত্রসাধনায় ব্যঞ্জিত হয়েছে। তিনি আধা বিমূর্ত জ্যামিতিক ফর্মের সাথে লোকজ মোটিফকে সম্পৃক্ত করেছেন। জ্যামিতিক ফর্মের ব্যবহার কাইয়ুম চৌধুরীর কাজেরও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তিনি মোটাদাগে নকশাপ্রধান চিত্রমালার জন্ম দিয়েছেন। তাঁর কাজে লক্ষণীয়ভাবে প্রযুক্ত হয়েছে নকশিকাঁথা, শীতলপাটি, হাতপাখা, হাঁড়িকুঁড়ি, পুতুলের অনুষঙ্গগুলো।

বাংলাদেশের চিত্রকলার চর্চায় যাঁরা রং নিয়ে প্রচুর কাজ করেছেন এবং যাঁদের আগ্রহের প্রধান বিষয় রং, তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে রশীদ চৌধুরী অন্যতম; তাঁর ছবিতে মৌলিক রঙের আধিপত্য রয়েছে এবং ক্যানভাসে রঙের ওঠানামার ফলে সংবেদন তৈরি হয়ে থাকে। ঐতিহ্যবাহী বাংলার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি ও নিসর্গকে তিনি নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন। এর সাথে মিশে আছে নস্টালজিয়া ও রোমান্টিকতার আবহ। পাট ও রেশমের সমাহারে তাঁর ট্যাপেস্ট্রি বা বুননশিল্প দেশজতার ধারায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বাংলার লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান হিসেবে তাঁর চিত্রকর্মে মহররম, যাত্রাগান, লাঠিখেলা, নববর্ষ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, সাপের পূজা ইত্যাদির প্রভাব রয়েছে। সরাচিত্র, মূর্তিকলা দ্বারা তিনি ছিলেন ব্যাপক প্রভাবিত। সুতা, পাট, রেশম ও ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়ে বুননশিল্পকে কাজের মাধ্যম করে নেন। বিষয় হিসেবে লোকজ কাহিনি, কথা, গান ইত্যাদিকে তাঁর কাজের বিষয়ীভূত করেন। বুনন মাধ্যমে তাঁর কিছু কাজের শিরোনাম থেকে তাঁর দেশজতার সম্পৃক্তি লক্ষ করা যায়। যেমন : *ষড়ঋতু*, *রোমান্স*, *জাদুঘর*, *আমার সোনার বাংলা*, *আদম*, *কালবৈশাখী* ইত্যাদি।

শিল্পী রশীদ চৌধুরীর সমসাময়িক একজন শিল্পী হলেন মুর্তজা বশীর। তিনি জলরং, তেলরং, ছাপচিত্র, ম্যুরাল ও মিশ্র মাধ্যমে কাজ করেছেন জাতীয় আবেগ-আকাঙ্ক্ষাকে ধর্তব্য করে। পাকিস্তান পর্বে বিশেষত ভাষা-আন্দোলনে তাঁর শিল্পসাধনার বিকাশ ঘটেছে। মুক্তিযুদ্ধ তাঁকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। *দেয়াল, কলেমা তৈয়বা, পাখা, শহীদ শিরোনাম, রমণী* তাঁর তেলরঙের কয়েকটি চিত্র। সমাজ-সচেতনতা, সংগ্রামী মনোভাব ইত্যাদি বিষয় প্রতিভাত হয় তাঁর আঁকা পোস্টারগুলো

এবং দেয়াল ও এপিটাফ নামের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চিত্রকর্মসমূহের মাধ্যমে। বাংলাদেশের মানুষের গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম তাঁর শিল্পসাধনার এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ঝামা ইট, পোড়ামাটি ইত্যাদি দেশীয় ঐতিহ্যবাহী উপাদান-উপকরণের সমন্বয়ে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মোজাইক চিত্র *শহীদবৃক্ষ* দেশজতার বিশিষ্ট উদাহরণ।

বাংলাদেশে যাঁরা লোককলাকেন্দ্রিক চেতনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঐতিহ্যানুসারী চিত্রকলার চর্চা করেছেন, শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী তাঁদের অন্যতম। তাঁর সমসাময়িক রশীদ চৌধুরীর সাথে এক্ষেত্রে তাঁর পার্থক্য হলো, তিনি লোকজীবনের উপচার, মূর্তিকলা, গল্প-কাহিনি বা শৈশবস্মৃতিকে প্রতীকী উপস্থাপনায় রূপায়িত না করে লোকজ নকশা ও মোটিফকে লোককলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজস্ব প্রেক্ষিতে প্রয়োগ করে থাকেন (আবুল মনসুর (২০০৭ : ৩৭)। নিসর্গ শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর চিত্রকলার মৌলিক রূপ হিসেবে উপস্থিত হয়। শাড়ির পাড়ের নকশা, নকশিকাঁথায় প্রচলিত মোটিফ, হাতপাখার নকশা, নৌকার গলুই, আলপনা, বাঁশ ও বেতের কারুকাজ, পিঠার ছাঁচ, শখের পুতুল অনায়াসে তাঁর ক্যানভাসে উঠে আসে। লৌকিক ফর্মকে তিনি বিমূর্তায়নের প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করেন। ত্রিমাত্রিক লোকশিল্পকে চিত্রতলে দ্বিমাত্রিকভাবে তুলে ধরেন। মাছ, পাখি, চোখ, সাঁকো, গাছ, পাতা, সূর্য, নৌকা প্রভৃতি চিরায়ত নৈসর্গিক, গ্রামীণ ও লোকায়ত উপাদানকে চিত্রকর্মের প্রয়োজনানুযায়ী কারুকাজের মতো করেই সজ্জিত করেন। গণ-অভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ তাঁর চিত্রকর্মকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। তাঁর চিত্রকর্ম সাবলীল, স্বতঃস্ফূর্ত।

উপনিবেশকে মোকাবেলার প্রশ্নে নব্যবঙ্গীয় কলকাতাকেন্দ্রিক চিত্রকলার ধারা যেমন এককালে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল, তেমনি পাকিস্তান পর্বে বাংলাদেশের শিল্পীগণ লোকজ ধারার ঐতিহ্যচেতনাকে অবলম্বন করে শিল্পচর্চার যে ধারাটির নবজাগৃতি ঘটিয়েছিলেন, তারও রয়েছে তৎকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে ব্যাপক ভূমিকা। সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক সংগ্রামে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশ নিয়েছিলেন ষাটের ও সত্তরের দশকে বাংলাদেশের প্রবীণ ও তরুণ শিল্পীগণ তাঁদের চিত্রকলায় দেশজ জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে বিষয়ীভূত করে। আধেয় হিসেবে এই ধারাটি বাংলাদেশের শিল্পকলায় কার্যকর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখেছে; এখনো অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করে আছে। শিল্পীগণ মূলত লোকায়ত সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের উপস্থাপনের মাধ্যমে পাকিস্তানি শাসকদের, বিশেষত সামরিক আইন প্রশাসকদের নীতিকে খারিজ করতে চেয়েছিলেন। স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিতকরণে ভাষা-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিকশিত বাঙালি জাতীয়তাবাদ তীব্র ও অসামান্য ভূমিকা রেখেছিল। স্বাধীনতার পরেও ভাষা-আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের শিল্পীদের এক অনিঃশেষ প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। আশির দশকের শিল্পীদের কাজে যুদ্ধপরবর্তী যে হতাশা, স্বপ্নভঙ্গ প্রতিফলিত হয়েছিল, তা নব্বইয়ের এরশাদবিরোধী সামরিক শাসনের সময়ে আর ছিল না; সেখানে স্থান করে নিয়েছিল জনগণের গণতান্ত্রিক

অধিকারবোধে উদ্দীপিত বিষয়-আশয়। স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে এদেশের চিত্রশিল্পীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। চিত্রকলায় স্থান করে নিয়েছিল জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের সাথে সম্পর্কিত চেতনা। মুর্তজা বশীরের কথা আগেই বলা হয়েছে, যিনি ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন তাঁর শিল্পীসত্তাসমেত; অর্থাৎ ব্যানার, পোস্টার, ব্যঙ্গচিত্র ও অন্যান্য প্রকাশনার প্রচ্ছদ ও অলংকরণের মধ্যেই তিনি সীমিত না থেকে সরাসরি সেই সাংস্কৃতিক সংগ্রামেও যুক্ত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য, তিনি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধেও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং সমকালে ও পরবর্তী সময়ে তাঁর চিত্রকলাকে মুক্তিযুদ্ধের চিত্রাবলি দিয়ে সমৃদ্ধ করেছিলেন। পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে বিশাল বিশাল চিত্র, ফেস্টুন ইত্যাদি ভাষা আন্দোলনের সময় থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত কালে অঙ্কনের মাধ্যমে এদেশীয় চিত্রকলাকে যাঁরা বিষয়বৈচিত্র্যে জাতীয়তাবাদী, গণমুখী করে তুলেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যাঁদের নাম তাঁরা হলেন : শিল্পী রশীদ চৌধুরী, মুস্তফা মনোয়ার, আব্দুর রাজ্জাক, হাশেম খান, রফিকুন নবী, বীরেন সোম প্রমুখ (ড. আব্দুস সাত্তার ২০২০ : ২২১)।

এ ছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের প্রকাশনাগুলো, পত্রপত্রিকা, স্মরণিকা ইত্যাদিও সমৃদ্ধ হয়েছিল বাঙালির ভাষা আন্দোলনকেন্দ্রিক চিত্রমালা দিয়ে। এসব চিত্রকর্মের মধ্যে দেখা মেলে মুষ্টিবদ্ধ হাত, ঈগলরূপী সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা, গুলিবিদ্ধ লাশ, পদপিষ্ট বাংলা বর্ণমালা ইত্যাদি উপাদানের। বাংলার আলপনা একুশের উদ্‌যাপনের এক অনুষঙ্গ হয়ে আছে; সবুজ ও লাল রঙে রঞ্জিত পতাকার মতোই পাকিস্তান পর্বেই শহিদ মিনারের নকশা ও স্থাপনা অভূতপূর্ব গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল। শহিদ মিনার তো বাংলাদেশের আধুনিক মোটিফ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার মর্যাদা পেয়েছে। লিনোকাটে মুর্তজা বশীরের *রক্তাক্ত একুশে* হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত একুশে ফেব্রুয়ারি সংকলনের জন্য আঁকা পাঁচটি স্কেচের একটি।

বিষয় হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের চিত্রকলায় প্রচুরভাবে এসেছে। কামরুল হাসানের *মুক্তিযোদ্ধা রমণী*-তে দেখা যায় কলসি কাঁখে আর কাঁধে রাইফেল নিয়ে এক নারীকে, যা আবহমান শাড়ি-পরিহিতা বাঙালি নারীর অন্তর্লীন শক্তিমত্তাকে প্রকাশ করে।

আত্মপরিচয়ের নির্মাণের মধ্য দিয়েই আমাদের দেশের আধুনিকতার সূচনা ঘটেছিল। বিমূর্ত চিত্রকলার চর্চার সূচনাও ঘটেছে এই আত্মপরিচয় নির্মাণের প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায়। শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য ইউরোপ-আমেরিকা বা জাপানে গিয়েছিলেন আর নতুন নতুন ধারণা ও টেকনিক আয়ত্ত করে দেশে ফিরে এসেছিলেন, তাঁরাও নিমজ্জিত ছিলেন দেশীয় শিল্প-ঐতিহ্যে।

সমসাময়িক কালে বাংলাদেশে রিকশা পেইন্টিং চিত্রকলার আলোচনায় গুরুত্ব পেয়ে থাকে। সিনেমার পোস্টার, ট্রাক পেইন্টিং ও রিকশা পেইন্টিং বাংলাদেশের

চিত্রকলার অপ্রাতিষ্ঠানিক ধারা। ষাটের দশকের বাংলাদেশের রিকশা পেইন্টিঙের বিষয়বস্তু ছিল সিনেমার পোস্টার প্রভাবিত নায়ক-নায়িকাদের ছবি। সেখানে অবশ্য প্রকৃতি ও নগরজীবনের ছাপও পড়ে। ফুল-পাখি ইত্যাদি নিসর্গ উপাদানের পাশাপাশি সত্তরের দশকে স্থান পায় ঢাকা শহরের কাল্পনিক চিত্রাবলি। পপ আর্টের অঙ্কনরীতির সাথে এর একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। স্মৃতিসৌধ, সংসদ ভবন, তাজমহল, আইফেল টাওয়ার, যমুনা সেতু ইত্যাদি স্থাপনার সাথে বিভিন্ন পশুপাখি, যেমন হরিণ, ময়ূর, বাঘ, ডাইনোসর, শিয়াল, খরগোশ প্রভৃতির নান্দনিক উপস্থাপন রিকশা, ট্রাক ইত্যাদিতে দেখা যায়। রিকশা পেইন্টিঙে লোকায়ত ধারার প্রভাব বিশেষ করে রেখার ব্যবহার অধিকমাত্রায় লক্ষণীয় (শাওন আকন্দ ২০১৪ : https://www.prothomalo.com)।

সমসাময়িক রিকশা পেইন্টিং

বাংলার পটশিল্পের ধারা সম্পর্কিত আলোচনা লোকশিল্পের গবেষণায় বারবার উঠে এসেছে। গুরুসদয় দত্তের জবানিতে পটশিল্প হলো এদেশের ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ চিত্রকলার সবচেয়ে উচ্চাঙ্গের ও উৎকর্ষমণ্ডিত ধারা। এমনকি বিলুপ্তির মুখে চলে যাওয়ার পরেও যে শিল্পসুষমা তার মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়, তা সত্যিই বাংলার শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলোর একটি হিসেবে একে প্রতিষ্ঠা করে। বাংলাদেশের বিক্রমপুরে পটচিত্রকলার সমৃদ্ধ ধারা প্রবহমান ছিল। পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত সেই ধারাকেও নগরজীবনের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ করে তোলার ব্রত কারো কারো মধ্যে আন্তরিকভাবে সঞ্চারিত হয়েছে। শম্ভু আচার্যের কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। মলয় বালা বলেন—

বিষয়, আঙ্গিক, উপকরণ এবং করণ-কৌশল কিছুটা বদলে নিয়ে শম্ভু আচার্য যে চিত্রকলা এঁকেছেন, তাকে পটচিত্রের নগর-সংস্করণ বলাই ভালো। লোকচিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য পরিলেখ বা সীমারেখার ব্যবহার। শম্ভুর কাজে রেখার পরিমার্জিত প্রয়োগ ছাড়াও ক্ষেত্রবিশেষে আলো-ছায়ার ব্যবহারে ত্রিমাত্রিক আবেদনের ফলে লোককলা ও চারুকলার যুগলবন্দী ঘটেছে (মলয় বালা ২০১৭ : https://www.prothomalo.com)।

শিল্পী শম্ভু আচার্যের পটচিত্র, জীবনযুদ্ধ

তিনি পটচিত্র আঁকেন মোটা ক্যানভাসে। চকের গুঁড়া, ইটের গুঁড়া ইত্যাদির সাথে তেঁতুলের আঠা মিশিয়ে তিনি প্রয়োজনীয় মিশ্রণ তৈরি করে থাকেন এবং এর দ্বারা মার্কিন কাপড় লেপে দেন। তাঁর রং তিনি তৈরি করে নেন গাছের কষ, বেলের কষ, ডিমের কুসুম, সিঁদুর, মশালের কালি, সাগুদানার ব্যবহারের মাধ্যমে। ছাগলের লোমের

তৈরি তুলিতে তিনি আঁকেন পৌরাণিক কাহিনি আর লোকায়ত জীবন; সেই সাথে নাগরিক জীবনের নানা দিককেও ঐতিহ্যবাহী এ শৈলীটির প্রয়োগে তিনি তুলে ধরেন। ফুটিয়ে তোলেন শেখ মুজিবকে কেন্দ্র করে মহাকাব্যিক আখ্যান *মহাপুরুষের অন্তর্ধান সহী শহীদ মুজীবনামা*। রাসলীলা, নৌকাবিলাস, মহররম, ফুল, পাখি, পাতা, কামার, কুমার, জেলের ছবিকে চিত্রিত করেন।

শিল্পী কামরুজ্জামান স্বাধীনের ইনস্টলেশন আর্ট *(দ্য ফাইব্রোয়াস সোলস)*

উপসংহার

বাংলাদেশে দীর্ঘকাল ধরে লোকায়ত সংস্কৃতির চর্চাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এই প্রবণতা দেখা গিয়েছিল ঔপনিবেশিক শিক্ষা-দীক্ষার আরোপিত আদর্শের বাস্তবায়নের ফলে; ফলে এখনো যাঁরা আমাদের দেশে লোকশিল্পের সমৃদ্ধ ধারাকে বিকাশমান রাখছেন অসাধারণ শৈল্পিক উৎকর্ষ বজায় রেখে, তাঁদের প্রতি সাধারণ শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর রয়েছে নাক-সিটকানো মনোভাব। কৃষকদের চাষা কিংবা জনসমাজের বিরাট অংশের যাঁরা বিভিন্ন ধারায় কারুকর্মে সৃজনশীলতা প্রয়োগ করে আসছেন, তাঁদের সামান্য মিস্ত্রি, মুচি, কামার, চামাররূপে দেখার প্রায় গালি অর্থে আমরা বিবেচনা করে থাকি। অতি উচ্চাঙ্গের বুননশিল্পীদের জোলা বলে অভিহিত করা হয়, যা প্রকারান্তরে ছোটলোকের বিনোদনের বিষয় হিসেবে আমাদের সমাজে আমাদের মনোভাবকে ব্যক্ত করে তোলে। অথচ চারুকলা উৎপত্তিগত অর্থে কারুকলাকে আশ্রয়

করেই বিকাশ লাভ করেছে। সরাসরি জীবনের কৃত্যমূলক সংস্কৃতিকে প্রতিফলিত করে থাকে এসব লোকজ সংস্কৃতি। যাপিত জীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে থাকে যেসব শিল্প, সেগুলোকে খারিজ করা যায় না। লোককলাকে অস্বীকার করে কোনো জাতি বড় হতে পারে না; পারে পরমুখাপেক্ষী হয়ে থেকে অর্থনীতির পাশাপাশি সাংস্কৃতিকভাবে দেউলিয়াত্ব প্রমাণ করতে। বাউলগান, মঙ্গল শোভাযাত্রা, জামদানি, শীতলপাটির মতো রিকশা ও রিকশাচিত্রও অতি সম্প্রতি ইউনেসকোর বিমূর্ত বিশ্ব-ঐতিহ্যের স্বীকৃতি লাভ করেছে। অথচ এই রিকশাচিত্র, যা চলমান সংস্কৃতির এক গুরুত্ববহ প্রকাশভঙ্গিকে অভিব্যক্ত করে থাকে আমাদের দেশের নাগরিক পরিসরে, তা এককালে আমরা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেম। যত দিন পর্যন্ত নীতিনির্ধারকেরা দেশীয় সংস্কৃতির বিকাশে উদ্যোগ না নিতে পারবে, আমরা বিউপনিবেশিত দৃষ্টিতে আমাদের দেশের খেটে খাওয়া মানুষের জীবনের উৎসার লোকশিল্পকে যথার্থ মূল্য দিতে শিখতে না পারব; আশা করতে পারি না আধুনিক বিশ্বদরবারে আমাদের মর্যাদাসম্পন্ন সংস্কৃতির উত্তরাধিকাররূপে নিজেদের মেলে ধরতে পারব। বলা বাহুল্য, আধুনিক ধারার চিত্রকলার চর্চা বাংলাদেশের এসব লোক-ঐতিহ্যকে ভিত্তি করেই আমাদের লোক ও জাতীয় মানসের প্রেরণা ও যাপনকে সমৃদ্ধি দিতে পারে।

সমসাময়িক কালে অনেকেই লোকজ চেতনায় অভিষিক্ত হয়েছেন চিত্রকলার চর্চা করতে গিয়ে। তাঁরা মেধাবী, নিরীক্ষাপ্রবণ ও প্রতিশ্রুতিশীল। তাঁদের মধ্যে অনেকেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাফল্যজনকভাবে বাংলাদেশের লোকায়ত সংস্কৃতির উপাদানগুলোকে এবং এর প্রাণসত্তাকে আধুনিক চিত্রকলার সাথে বিরোধ না ঘটিয়ে উপস্থাপন করে যাচ্ছেন। কামরুল হাসান, রশীদ চৌধুরী, আবদুস শাকুর শাহ বা কাইয়ুম চৌধুরীদেরও তাঁরা পরের প্রজন্ম। বাংলাদেশের চিত্রকলার লোকায়ত ধারায় কোনো না কোনোভাবে সম্পৃক্ত তাঁদের পরিশ্রমী সাধনাই এখনকার বাংলাদেশের চিত্রকলাকে বিশ্বের চিত্রকলার দরবারে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলেছে।

গ্রন্থপঞ্জি

আবুল মনসুর (২০০৭) ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে সাম্প্রতিককাল, চারু ও কারু কলা (লালা রুখ সেলিম সম্পা.), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা

আহমাদ ইশতিয়াক (২০২১) চিরকালের শিল্পের পথিক শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন https://bangla.thedailystar.net/node/227245 (Accessed 26 November 2023)

ওয়াকিল আহমেদ (২০১৭) *বাংলার চারু ও কারু লোকশিল্প*, গতিধারা, ঢাকা

জাহিদ মুস্তফা (২০১৪) প্রাচ্য চিত্রকলার অভিযাত্রা https://www.kaliokalam.com, / (Accessed 26 November 2023)

ড. আব্দুস সাত্তার (২০২০) *শিল্পবোধ ও শিল্পবিচার*, একাত্তর প্রকাশনী, ঢাকা

নির্মাল্য নাগ (২০০০) *শিল্প চেতনা*, দীপায়ন, কলকাতা

নজরুল ইসলাম (২০১৯) বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা স্বাধীনতার আগে ও পরে, বাংলাদেশের চিত্রকলা

বিচিত্র বিন্যাস ইতিহাসের পাঠ (রাশেদ সুখন সম্পা.), নৈঋতা ক্যাফে, ঢাকা

মলয় বালা (২০১৭) পটচিত্রের নগর সংস্করণ, https://www.prothomalo.com/onnoalo/(Accessed 2 December 2023)

শাওন আকন্দ (২০১৪) বাংলাদেশের রিকশাচিত্র https://www.prothomalo.com/special- (Accessed: 1 December 2023)

সৈয়দ আলী আহসান (২০০৪) *শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা

Encyclopaedia Britannica (2010), 15th edition, Encyclopaedia Britannica Inc., Chicago